KALIKATA LITTLE MAGAZINE LIBRARY-O-GABESHANA KENDRA
18/M TAMER LANE, KOLKATA-700009

Record No : KLMLGK 2007	Place of Publication : ৩৪/২ মাহিমহাজন্মাহত স্ট্রীট, কল ২৬
Collection : KLMLGK	Publisher ঈশ্বর গঙ্গোপাধ্যায়
Title অনুরাগ (ANURAAG)	Size 8.5"/5.5"
Vol & Number 7 8 9 10	Year of Publication : Jan 1996 May 1996 Sep 1996 Jan 1997
	Condition : Brittle Good ✓
Editor ঈশ্বর গঙ্গোপাধ্যায়	Remarks

C.D. Rod No : KLMLGK

অনুরাগ

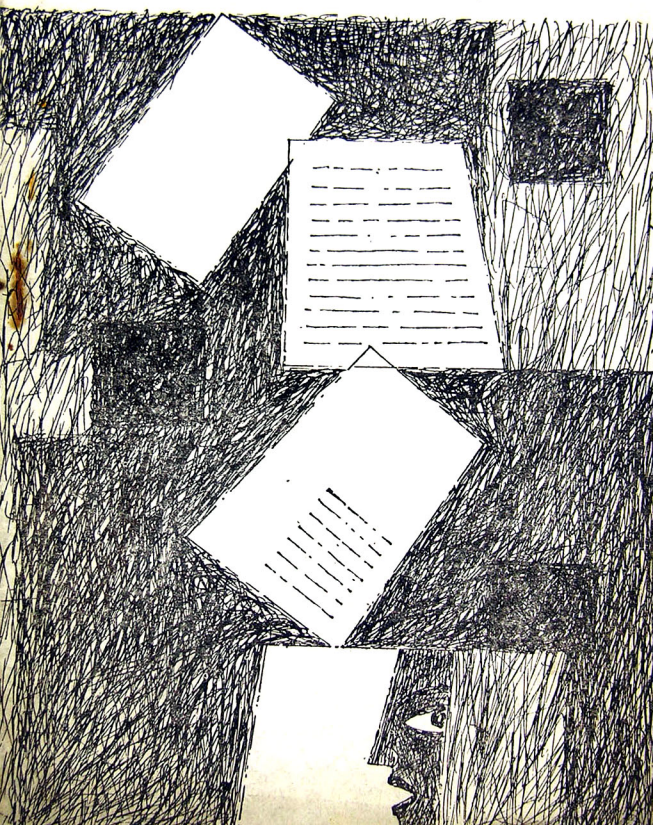

প্রতিষ্ঠাতা ঃ বিশ্বনাথ ঘোষ। সভাপতি ঃ উদিতেন্দুপ্রকাশ মল্লিক
পৃষ্ঠপোষক ঃ শান্তি রায়, দীপালী চৌধুরী, কমলপাণি রায়চৌধুরী
অপরেশ সেন

অনুরাগ

সপ্তম সংকলন ঃ মাঘ ১৪০২ বঙ্গাব্দ
জানুয়ারি ১৯৯৬

উপদেষ্টা ঃ প্রণয়কৃষ্ণ গোস্বামী
সম্পাদক ঃ ধীরা ভট্টাচার্য

সহযোগী ঃ জয়ন্তী সান্যাল, বিউটি মজুমদার, মীনা বসু, অর্চিতা রায়চৌধুরী
সাংগঠনিক-প্রধান ঃ ঋতা বন্দ্যোপাধ্যায়

অনুরাগ প্রকাশন
৩৪/২ মহিম হালদার স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০২৬

অনুরাগ

সপ্তম সংকলন ঃ মাঘ ১৪০২

জানুয়ারি ১৯৯৬ তৃতীয় বর্ষ প্রথম সংখ্যা

সূচীপত্র

প্রচ্ছদ ঃ উজ্জ্বল গোস্বামী

সত্য প্রেস, ১০/২এ প্যারীমোহন সুর লেন, কলি-৬ থেকে মুদ্রিত।

পাঁচ টাকা

সাহিত্যমেলা

অনুরাগ সাহিত্যবাসরের মাসিক অধিবেশন একেক বার প্রায় সাহিত্যমেলার আকার ধারণ করে। গড়িয়া, যাদবপুর, বেহালা, ঠাকুরপুকুর, শ্রীরামপুর, বৈদ্যবাটী, হালিশহর থেকেও আমাদের এখানে লেখকরা আসেন তাঁদের রচনা নিয়ে। একেক দিন ২৫/৩০ জন লোক হয়ে যায়। তখন একটু বসবার অসুবিধেও হয়। কুড়ি জন পর্যন্ত ভালভাবে বসা যায়। দু ঘণ্টা ধরে যত গল্প কবিতা প্রবন্ধ ভ্রমণ কাহিনী স্মৃতিকথা পড়া হয় তার পরিমাণ প্রায় দুই শত পৃষ্ঠা হবে।

অনুরাগের এই ব্যাপ্তি দেখে আমরা অবশ্যই খুশি। সাহিত্যানুরাগীরা যে অনুরাগকে ভালবাসেন এটা তারই প্রমাণ। পত্রিকার ব্যাপারেও আমাদের সেই অবস্থা। যত লেখা পাওয়া যায় সব স্থান সংকুলান হয় না।

'অনুরাগ' কোন রাজনৈতিক দলের অনুগামী নয়। রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় ভাবনাকে আকাদেমিক পর্যায়ে দেখে 'অনুরাগ'। বাংলা-ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি অনুরাগ থেকেই এর নাম 'অনুরাগ'। এই অবসরে আরো একটা কথা জানিয়ে রাখা দরকার যে 'অনুরাগ' হাল আমলের আধুনিক নয়, বরাবরের আধুনিক ; চিরকালীন।

১৬. ৯. ৯৫-এর সভায় আমাদের শ্রীমতী দীপালী চৌধুরী অনুরাগের জন্য ১০০১ টাকা দিয়েছেন। আমরা বছরে ছয় হাজার টাকা ব্যবস্থা করতে পারলে তবেই নিয়মিত অনুরাগ প্রকাশ করতে পারি। অনুরাগ বছরে তিন বার প্রকাশিত হয়। বইমেলা, পঁচিশে বৈশাখ, শারদীয়। জানুয়ারি,মে, সেপ্টেম্বর। অনুরাগের সাহিত্যসভা প্রতি মাসে তৃতীয় শনিবার সন্ধ্যা ৬টায় হয়, কেবল নবেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারি চার মাস হয় সাড়ে পাঁচটায়।

অনুরাগের কামনা, কোথাও যেন বাংলাভাষার অনাদর না হয়। 'অনুরাগ' বাংলাভাষার মর্যাদা রক্ষার প্রহরী। সে তার সীমিত ক্ষমতা নিয়ে এই দায়িত্ব পালনে ব্রতী। □

খোলা চিঠি

শ্রীবিশ্বনাথ ঘোষ প্রতিষ্ঠাতা ঃ 'অনুরাগ', কলকাতা

শ্রদ্ধাবরেষু,

'অনুরাগ' ষষ্ঠ সংকলনে (আশ্বিন ১৩০২) আপনার 'খোলা চিঠি' দেখলাম। শ্রীপ্রণয়কৃষ্ণ গোস্বামী তথা প্রণয় দা'কে লেখা আমার পত্রে আপনার খুব আনন্দ হয়েছে জেনে ভালো লাগলো। আপনি যথার্থই লিখেছেন, ভাষাই আমাদের বড়ো মাধ্যম। এ-প্রসঙ্গে বলি ; ভাষা আন্দোলন ও আমাদের স্বতন্ত্র রাষ্ট্র, সমার্থক না-হলেও ভাষা আন্দোলনই পরোক্ষে আমাদের স্বাধীনতাকে অনেকটা এগিয়ে দিয়েছিলো। এ-আন্দোলনেই আমাদের স্বাধীনতার বীজ উপ্ত ছিলো বলে আমি মনে করি। এই সাথে আপনার অবগতির জন্যে সবিনয়ে বলি, আমার কোনো রাজনৈতিক ভাবনা বা দর্শন নেই। ও-সব থাকলে আমি হয়তো রাজনৈতিক শ্লোগান লিখতে পারতাম কিন্তু কবিতা লিখতে পারতাম না।

আমার ভাষা-প্রীতি আছে এবং এই প্রীতিবোধ থেকেই প্রণয় দা'র পুরস্কার প্রাপ্তিতে অভিনন্দন জানিয়েছি। □

—মঈনুল ইসলাম চৌধুরী সিলেট, বাংলাদেশ ৭-১১-৯৫

'তুমি সংসারে থাক তাহাতে দোষ নাই, সংসার তোমাতে না থাকিলেই হয়। জলের উপর নৌকা থাকিতে পারে, কিন্তু নৌকায় জল উঠিলেই ডুবে যায়।' —শ্রীরামকৃষ্ণ

শ্রীউমাপ্রসাদ ভট্টাচার্য

নৃত্যের তালে তালে বিশ্বনাথ ঘোষ

বিশ্ব যখন প্রলয় আতঙ্কে ভীত, রবীন্দ্রনাথ তখন গাইলেন—"প্রলয় নাচন নাচলে যখন, হে নটরাজ"। সে গান ভারতের বাঙালী সমাজকে শোনালেন পঙ্কজ মল্লিক ! কিন্তু নিরাকার ঈশ্বর সাকার নটরাজ রূপ নিয়ে কোথায় কবে প্রতিষ্ঠিত তাই দেখার জন্য সবাই ছুটলেন দক্ষিণ ভারতে। সম্ভবত ২৫০০ বছরের পূর্বে তৈরী তামিলনাড়ুর ১২টি গোপুরম ঘেরা, হাজারটি নয় ৯৮৫টি থামের উপর ৮৪৭ ফুট লম্বা আর ৭৩০ ফুট চওড়া মাদুরাই-এর মীনাক্ষী দেবীর মন্দিরের গর্ভগৃহে তার দেখা পাওয়া যায়। তারপর কন্যাকুমারী, রামেশ্বরম, ত্রিবান্দ্রাম ইত্যাদি দক্ষিণ ভারতীয় মন্দির গুলিতেও আমরা দেখলাম ঐ মূর্তি এবং তার রমরমে বাজার। রবীন্দ্রপ্রেরণায় বাঙলার তো বটেই, ভারতেরও কলা-শিল্প-সাংস্কৃতিক কলকারখানাগুলি হয়েছে শান্তিনিকেতনে বিশ্ব-ভারতীর প্রাঙ্গণে। কবি তো বলেইছেন "লেখাজোখার কারখানাতে দুয়ার রুদ্ধে বচন কুঁদে খেলনা আমায় হয় বানাতে"। আর সেই খেলনা তৈরীর মাল-মশলা সংগ্রহ করতে কখনও তিনি যান মণিপুর-জাভা, কখনও কেরল-কর্ণাটক, কখনও অন্ধ্র-তামিলনাড়ু। আর নিয়ে আসেন আধুনিক নৃত্যনাট্যের সব চিন্তা ভাবনা। তৈরী হয় নটীর পূজা, শ্যামা, চন্ডালিকা ইত্যাদি।

উদয়শঙ্কর উদয়পুরে জন্মে সেখানের রাজ দরবারে বসেই দেখেছেন নাচ। আর লন্ডনে শিখতে গিয়েছিলেন অঙ্কন বিদ্যা কিন্তু আনা পাভলোভা তাঁকে মাঝ পথে বানিয়ে দিলেন বিখ্যাত নৃত্যশিল্পী। পরবর্তীকালে নামবোদ্রিপাদকে গুরু মেনে, ফরাসী মহিলা সিমকির গুরু হন এবং অমলা নন্দীর স্বামী আর আনন্দশঙ্করের ও মমতাশঙ্করের পিতা হয়েছেন উদয়শঙ্কর।

কলকাতার মঞ্চেই আমরা দেখেছি, অপূর্ব সুন্দরী ইন্দ্রাণী রামানকে তাঁর মায়ের কাছে তালিম নিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ভরত নাট্যমের আসর জমিয়েছেন। এসবের পর কাঠ্ঠের দক্ষিণী সঙ্গীত নাট্য ব্যাকরণ পদ্ধতিকে আঙ্গুল দেখিয়ে সত্যজিৎ রায়—যামিনী কৃষ্ণমূর্তিকে বলেছিলেন—আপনার নৃত্যের বোধহয় প্রতিটি মুদ্রাকেই আমি অনুসরণ করতে পেরেছি। তাহলে এবার বলতেই হবে—"তলায় গেল ভগ্নতরী কূলে এলেম ভেসে, এলেম নূতন দেশে"। আমরা পেলেম নূতন যামিনী কৃষ্ণমূর্তিকে। যিনি ১৯৯৫ সালে পঞ্চাশ উত্তীর্ণ হয়ে এক দক্ষ হিসাব পরিক্ষক (Accountant) কে বিবাহ করেছেন। নাম ধাম তাঁর জানতে পারলে মনে রাখবেন। আর মনে রাখবেন যামিনী কৃষ্ণমূর্তি মুদ্রা শিক্ষা নিয়েছেন মাদ্রাজের মহিলাপুরম মন্দিরের এক শেষ সেবাদাসী গৌরী আম্মার কাছে। যামিনীর পিতা এস কৃষ্ণমূর্তি অন্ধ্রের মানুষ।

এবার বালি পণ্ডিত বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য আজ আর জীবিত নেই, থাকলে দক্ষিণের আরও অনেক কথা আমরা জানতে পারতাম। তিনি তামিল, তেলুগু, কর্ণাটী, কেরলী চারটি ভাষাই জানতেন।

দক্ষিণের সব নাহলেও অনেক বিষয় মিল আছে উড়িষ্যার। দেখা যায়, পুরীর জগন্নাথের গলায় মালা দিয়ে যে মহিলা নৃত্য-শিল্পী দেবদাসী হয়েছিলেন তাঁর নাম—কোকিলা প্রভা, মৃত্যু হয়েছে ১৯৯৩ সালের ১৯শে ডিসেম্বর। এই পদটির দায়িত্বে আছেন নৃত্যশিল্পী পরশমণির পর শশীমণি। কিন্তু নটরাজের জটার বাঁধন এখনও আলগা হয়নি। পদটির জন্য সরকারের কাছে আবেদন করেছেন—৫০ থেকে ১৫ বছরের ৫টি স্কুল কলেজে পড়া মহিলা। কিন্তু জটিলতা কমেনি।

এবার দুটি তামিল বন্ধুর কথা বলে নিবন্ধটি শেষ করছি—

১। ডঃ রঙ্গনায়েকী। ২। সুব্রমণিয়ম কৃষ্ণমূর্তি।

ডঃ বিজয় মহাপাত্রের স্ত্রী তামিল কন্যা, উৎকল গৃহবধূ, বাঙালী মুখার্জী সন্তানের শ্বশ্রূ সেদিন 'অনুরাগ' সম্বন্ধে আলাপচারী হলেন। এবং দুঃখ আর গর্ব মিশিয়ে জোরাল বক্তব্য রাখলেন সুব্রমণিয়ম কৃষ্ণমূর্তি শরৎ চট্টোপাধ্যায়ের ১১৯তম জন্ম পূর্তি উৎসবে ভারতীয় ভাষা পরিষদের মাতব্বরদের মিষ্ট ব্যঙ্গের মধ্যে।

মনে পড়ে গেল ১৯১৭ থেকে সোভিয়েট রাশিয়ার ৭০ বছরের কাহিনী। □

রুমটেক বৌদ্ধ গোম্ফার পথে দীপালী চৌধুরী

গ্যাংটকের হোটেল, শান্তিনিকেতন গেষ্ট হাউসে গতকাল এসেছি। আজ সকাল সাতটার মধ্যে আমরা তৈরি হয়ে নিলাম সিকিমের বিখ্যাত রুমটেক বৌদ্ধ গোম্ফা দর্শনের উদ্দেশ্যে। একটি মারুতি ভ্যানে চেপে রওনা হলাম আমরা। এই গোম্ফায় গ্যাংটক থেকে বাসেও যাওয়া যায়। দূরত্ব ২৪ কিঃ মিঃ। গ্যাংটক শহরের পশ্চিমে এই গোম্ফাটিতে গোটা পথটি অপূর্ব সুন্দর নৈসর্গিক শোভায় ভরপুর। শহর ছাড়িয়ে রামীনদীর ওপর রামীপুল পেরিয়ে আমাদের বাহন চলেছে এগিয়ে। পথের বাঁ-পাশে সুউচ্চ সবুজ পাহাড়ের বুক চিরে রামীনদীর ফিকে সবুজ জলধারা বয়ে চলেছে নিঃশব্দে, এঁকেবেঁকে। আসলে তিস্তারই এটি একটি লামানদী। স্থানীয় নাম "রামীনদী"। এখানে পথের দুই পাশে ঝাউ, পাইন, পেথডিয়া ও বাঁশঝাড়ের এক শান্ত আরণ্যক শোভা চোখ জুড়িয়ে দেয়। বাঁপাশে পাহাড়ের মাথায় সাদা ধবধবে তুষার শৃঙ্গের দৃশ্য দেখা যাচ্ছে হালকা কুয়াশার ওড়নার তলায়। সুনীল আকাশে সাদা মেঘেরা ধীরে ধীরে ভেসে চলেছে। আর আকাশের নীচে আমরা চলেছি পুলকিত চিত্তে। পাহাড়ের ধাপে ধাপে কাঠ টিন ও পাথরের তৈরি সব রঙিন বাড়ীগুলি কেমন যেন রোম্যান্টিক এক পরিবেশের সৃষ্টি করেছে।

এই অঞ্চলে লোকজন সব ভুটিয়া, লেপচা ও নেপালী—মঙ্গোলিয়ান চেহারার মেয়েরা কর্মঠ বেশী। ছেলেরা বেশীরভাগ পানাসক্ত বলে একটু যেন ঝিমিয়ে পড়া। তবে ব্যবহার সবার খুবই ভদ্র ও শান্ত। রঙিন বাড়ীগুলির সামনে থাকে থাকে সবুজ ধান ক্ষেত। অর্থাৎ টেরাস প্রথায় চাষ হয়েছে এই অঞ্চলে। আর আছে

সবার বাড়ীর সামনে বিভিন্ন রঙের মসুমি ফুল, ফার্ন ও ক্যাকটাস। সবাই এখানে বাগান করতে ভালবাসে। সিকিম অঞ্চল ফুল ও ফার্নের জন্য বিখ্যাত। পাহাড়ের গায়ে ছোট ছোট জায়গায় নানান ধরনের সব্জির বাগানও দেখা যাচ্ছে। এক কথায় রুমটেকের গোটা পথটাতে সিকিমের মন মাতানো নৈসর্গিক সৌন্দর্যের অনেকটাই যেন ধরা আছে।

২৪ কিঃ মিঃ পথ যেন চোখের পলকে শেষ হয়ে গেল। আমরা পৌঁছে গেলাম রুমটেক বৌদ্ধ মন্দিরের দ্বারদেশে। তবে মর্য্যাদা-সম্পন্ন দ্বারদেশটি এখন আর আগের মত চট করে দেখা যায় না। কারণ মন্দিরের প্রবেশ পথে এখন একটি উঁচু আধুনিক পাকাবাড়ী উঠছে জাপানীদের আর্থিক সাহায্যে। এই বাড়ীটি এই সুদৃশ্য পাহাড়ে দারুণ বেমানান এক কেজো আধুনিক চৌক বাড়ী, এক কথায় চক্ষু পীড়াদায়ক। আমরা একটি গলিপথ ধরে এসে টিলাপাহাড়ে মাথায় অপরূপ গঠনশৈলীর তিনতলা, কাঠ ও টিন দিয়ে তৈরী রুমটেক বৌদ্ধ মন্দিরের দর্শন পেলাম। যেন মনে হয় অপূর্ব সুন্দর বর্ণময় দেয়ালচিত্রে চিত্রিত একটি বিশাল মর্য্যাদাসম্পন্ন রাজপ্রাসাদ দেখছি। যত মন দিয়ে দেখছি মন্দিরের বাইরে চকচকে কাঠের দেয়ালের অতিসুক্ষ্ম দেয়াল চিত্রগুলি যেন বিস্ময় উৎপাদন করছে। যেন মনে হয় কাজগুলি এই মাত্র করা হয়েছে—এতো সজীব। চিত্রে রয়েছে কত রকমের ফুল লতা-পাতা, পশু পাখী, শাঁখ এবং আরো কত কি যে আঁকা আছে তার সীমা, সংখ্যা নেই। ফুলের মধ্যে পদ্মফুলের প্রাধান্য রয়েছে, আর রয়েছে শাঁখের প্রাধান্য। শাঁখ এবং পদ্মফুল দুটোই মঙ্গলের চিহ্ন। দেয়াল চিত্রগুলিতে লাল, হলুদ, নীল, সবুজ, সাদা, খয়েরী এবং আরো অনেক উজ্জ্বল রঙ ব্যবহার করা হয়েছে। তাতে যেন চিত্রগুলি আরো সজীব হয়ে উঠেছে। বার বার ফিরে ফিরে দেখছি দেয়াল চিত্রগুলি।

মূল মন্দিরের অভ্যন্তরে, মাঝখানে আছেন ধ্যান সমাহিত বুদ্ধদেবের উপবিষ্ট বিশাল বড় সোনালী রঙের মূর্তি। গৌতম বুদ্ধের পাশে রয়েছেন গুরু পদ্মসম্ভবার মূর্তি। মন্দিরের ভেতরেও দেয়ালে ও ছাদে অপূর্ব রঙিন সব সূক্ষ্ম চিত্রকলা। বুদ্ধদেবের বেদীর ডানপাশে উঁচু কাঠের টেবিলে সারি সারি ঘীয়ের প্রদীপ সাজানো আছে। ধূপ ফুল ও ঘীয়ের গন্ধ ভেসে বেড়াচ্ছে মন্দিরের অভ্যন্তরে। অদ্ভুত সুন্দর, পবিত্র ও শান্ত পরিবেশ এই রুমটেক বৌদ্ধ মন্দিরের। এই গোম্ফাটি প্রায়ত ষোড়শ অবতার করমা-পা-লামা ১৭১৭ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠা করেন। একবার আগুন লেগে পুড়ে গেলে আবার সংস্কার করা হয়। এটি কার গিউগ পা বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের অধীন এবং তিব্বতী রীতিতে গঠিত। গোম্ফাটি সিকিমের অন্যতম প্রধান আবাসিক লামা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র। এখানে "নালন্দা" নামে বৌদ্ধধর্মে উচ্চ জ্ঞান লাভের একটি পাঠকেন্দ্র আছে। এক কথায় এতো সুন্দর ধর্মীয় শিল্পে সমৃদ্ধ জমকালো বিশাল বড় বৌদ্ধমঠ এর আগে আর দেখেছি বলে মনে পড়ছে না।

এবার মূল মন্দির থেকে বেরিয়ে চলে এলাম মূল মন্দিরের পিছন দিকে অপেক্ষাকৃত ছোট মন্দিরটিতে। এটা হল এখানকার ধ্যান মন্দির। কারুকার্যময় কাঠের বন্ধ দরজা খুলে ঢুকতেই দেখা পেলাম বেশ কয়েকজন ধ্যানমগ্ন সাহেব ও মেমসাহেবদের ধ্যানরত গেরুয়াধারী, মুণ্ডিতমস্তক, সৌম্য বৌদ্ধ লামাদের পাশে। ঘরের মধ্যে চারপাশে সোনা, রূপা ও দামি দামি পাথরের ছড়াছড়ি দেখে চোখ যেন ধাঁদিয়ে গেল। ঘরের ঠিক মাঝখানে রয়েছে সলিড সোনার একটি স্তূপ বা চোর্তেন। ঘরের চার দেওয়াল জুড়ে কাঁচের শোকেসে রয়েছে বুদ্ধদেবের নানান মুদ্রায় সোনার তৈরি সব অপূর্ব সুন্দর মূর্তি জাতক বাহিনীকে ঘিরে। গুরু পদ্মা-সম্ভবা ও তন্ত্রের নানান দেবদেবীর সোনার তৈরি মূর্তিও রয়েছে

এখানে। ঘরটিতে কোটি কোটি টাকার সম্পদ রয়েছে। তবে এই ঘরের সব মূর্তি ও দেয়ালচিত্রের বর্ণবৈচিত্র ইত্যাদি দেখে মনে হবে উঁচুদরের একটি আর্ট মিউজিয়াম রুমটেকের এই ধ্যান মন্দিরটি। যে শিল্পীরা এই অপরূপ শিল্প সৃষ্টি করেছেন তাদের নামেরও চিহ্ন কোথাও দেখতে পেলাম না। এই সৌন্দর্য সৃষ্টির জন্য অদেখা অচেনা শিল্পীদের মনে মনে প্রণাম জানালাম। এই ধ্যান ঘরের পিছনেই রয়েছে পাহাড়ের ধাপে ধাপে শিক্ষার্থী লামাদের কলেজ হোস্টেল গেস্ট হাউস ইত্যাদি। পাহাড়ের ওপর রুমটেকের সবুজ মখমলের মত লনের চারপাশ ঘিরে রয়েছে বিভিন্ন রঙের মৌসুমী ফুলের শোভা। ফুলের রঙ এখানে যে এতো সজীব কি করে হয় কে জানে। পাহাড়ী আবহাওয়াই বোধ হয় এই বর্ণসজীবতার কারণ। সবকিছু দেখা হয়ে গেলে সবুজ লনে এসে দেখা পেলাম শিক্ষার্থী তরুণ লামাদের একটি দলকে। গেরুয়াধারী সৌম্যদর্শন লামাদের সাথে কিছুক্ষণ কথাবার্তা হল। অত্যন্ত ভদ্র ও আস্তে আস্তে শান্তভাবে কথা বলেন এরা। এই মন্দিরে একটি জিনিস লক্ষ্য করলাম যেখানে যার সঙ্গেই দেখা হচ্ছে সে কর্মী হোক অথবা লামা হোক সবার মুখে মিষ্টি প্রশান্ত হাসির রেখা লেগে রয়েছে। জানি না এই মানসিক অবস্থা কি এই মুহূর্তে আমার না ওদের।

খুব আনন্দিত চিত্তে আবার গাড়ীতে এসে বসলাম। এবার আবার গ্যাংটক শহরের পানে গাড়ি চলতে লাগলো। হঠাৎ পথের বাঁকে দুইজন সুবেশী ও সুশ্রী সিকিম তরণী রুমাল নেড়ে আমাদের গাড়ি থামিয়ে অনুরোধ জানালো ওদের যেন গ্যাংটক শহরের মুখে একটি গ্রামে নামিয়ে দিয়ে যাই। ওদের তুলে নিলাম আমরা গাড়িতে। হাসিখুশী তরুণরা এমনভাবে আলাপে, পরিচয়ে, গল্পে আমাদের সঙ্গে জমে গেল মনেই হচ্ছে না ওদের আগে দেখিনি। বড় সহজ ও স্মার্ট এরা। ওদের গন্তব্যস্থল

এসে গেলে ওরা নেমে গেল। আমরা ওদের একটি ছবি তুলে নিয়ে আবার এগিয়ে যেতে লাগলাম। যতদূর পর্য্যন্ত ওদের দেখা গেছে ওরা রুমাল নেড়ে নেড়ে আমাদের সঙ্গে ওদের অন্তরঙ্গতা জানিয়েছে। একটি পাহাড়ী পথের বাঁকে ওদের আমরা হারিয়ে ফেললাম। কিন্তু মনের গভীরে অমূল্য স্মৃতির ভাণ্ডারে ওরা কিন্তু চিরদিনের মত রয়ে গেল। এরকম রয়ে গেছে আরো আরো অনেকে। □

পাখির বেশে সত্য বসু

হরিয়াল পাখিটা শিস দিল।

—বেশ কড়া রোদ হয়েছে আজ তাই না?

উত্তরে পাখিটা আবার শিস দিল।

—দেখেছো পাখিটা আবার এসেছে। ঠিক ভরদুপুরে রোজ আসছে।

—তুমি এইসময় ছাদে আসো ও জানে। তোমার টানে আসে। না কি তুমিই ওর টানে ছাদে আসছ?

আহা, শিখা বলল, আমি তো বরাবর এসময় ছাদে চুল শুকোতে আসি। রোজ একা আসি, আজ তুমি আমার পিছু নিয়েছ।

সুদীপ বলল, পাখিটাকে তাড়িয়ে দোব?

—ওমা কেন? অমন সুন্দর পাখি। আজ অবশ্য ও কাছে আসবে না। তোমায় দেখেছে তো! অন্যদিন আমার একদম কাছে চলে আসে। আমার হাতে বসে, পিঠে বসে, কাঁধে বসে...

—আমার ইচ্ছে করে আমি পাখি হই।

—পাখি হবে? বেশ। ধরা যাক, তোমার ইচ্ছাপূরণ হল। তারপর?

—তারপর তোমার কাছে আসব। কাঁধে বসব, পিঠে চড়ব, তোমার ঠোঁটের কাছে ঠোঁট, বুকের কাছে বুক...

—নাহ্ না। শিখা যেন আর্তনাদ করল।

—না কেন শিখা?

—পাখি হবার পরও তুমি মানুষ থাকবে। □

পিছনে লাগা শ্রীবিষ্ণুচরণ ভট্টাচার্য্য

আজকাল গণ-মাধ্যমে র‍্যাগিং ও ইভ-টিজিং নিয়ে নানা আলোচনা চলছে। কিন্তু এসবের মূলে মানুষের অন্যের পিছনে লাগার যে প্রবৃত্তি কাজ করছে, সেই শাশ্বত মানসিক সমস্যাটির কিভাবে মোকাবিলা করা যায়, আপনারা তা বাতলে দিতে পারবেন আশা করছি।

একটু জ্ঞান হবার পর থেকেই চারিদিকে এই পিছনে লাগা ব্যাপারটি দেখে আসছি। রমার বাচ্ছার বয়েস সবে মাস ছয়েক, এক আহ্লাদী পিসি একদিন এসে হাজির। বাচ্ছা পিসিকে পছন্দ করছে না। তবুও তাকে কোলে নিয়ে সোহাগ করার কতো চেষ্টা, গাল টিপে দিচ্ছে, চুমু খাচ্ছে। বাচ্ছা যতো তারস্বরে চেঁচাচ্ছে, পিসি ততো আহ্লাদে গদগদ হয়ে "না না, কাঁদে না সোনা" বলে আদিখ্যেতা দেখাচ্ছে। শেষে যখন কান্নার মাত্রা সপ্তমে চড়লো. বাচ্ছা কেঁদে, ঘেমে দমবন্ধ হবার উপক্রম, পিসি মুখে একরাশ বিরক্তি নিয়ে—"কি ছেলে বাবা, নে মিনি তোর ছেলেকে" বলে বাচ্ছাকে মুক্তি দিল। সব বাচ্ছা সকলের কাছে যেতে চায় না। চেনা-অচেনা ব্যাপার আছে। তবুও সে যতো বিরক্তই হোক, অনেকের তাকে আদর করতেই হবে। বাচ্ছা পুতুল নিয়ে আপন মনে খেলা করছে, দুবছরের বড়ো খুকুটি পুতুলটি কেড়ে নিয়ে তাকে কাঁদাবেই। ও ছেলেমানুষ ওর কথা ধরছি না। কিন্তু বাচ্ছা একটা বেলুন নিয়ে নাড়াচাড়া করছে. বুড়োমদ্দ দাদা এসে "দেখি দেখি" বলে যেই বেলুনে হাত, অমনি বেলুন ফটাস। বাচ্ছার তখন সে কি কান্না,—নিজের হাতে ওটি এক সময় ফাটতোই, কিন্তু দাদা ফাটিয়ে দিল কেন? একবার আমার বাচ্ছা নাতনীকে ইলেকট্রনিক খেলনা মোটর দিয়েছি,

দিব্বি আনন্দে খেলা করছে। এমন সময় ওর কাকা অফিস ফেরৎ এসে হাজির। অফিসের কাপড়-জামা ছাড়ার সময় নেই, চোখ পড়ে গেল মেয়েটার উপর, ওটি নিয়ে এটা নাড়ছে, ওটা নাড়ছে, কিছুক্ষণ বাদেই মোটরের নড়াচড়া বন্ধ। নাতনীর সেকি কান্না। আরে বাবা, তোমাদের ছেলেবেলায় মার্বেল, কড়ি, কাঠের ঘোড়া এসব নিয়ে খেলতে, তাই এখন বাচ্ছাদের দামী খেলনা দেখলে একটু লোভ হতেই পারে। তা ওকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে রয়ে-সয়ে খেলনাটা নাড়াচাড়া করো, তা নয় সঙ্গে সঙ্গেই ওটির দফারফা না করলে যেন শান্তি নেই।

যদুবাবুর বড় একান্নবর্তী পরিবার, ওর এক নাতি পল্টু গত বছর ৫ম শ্রেণী থেকে ফার্স্ট হয়ে ক্লাসে উঠেছে, এবছরও খুব খাটছে ফার্স্ট হবে বলে। একদিন হঠাৎ যদুবাবুর কানে এল রাড়ীর বড় নাতিটি স্কুলের কোনো এক মাষ্টারের কাছে শুনে এসেছে যে এবছর পল্টু ফার্স্ট হতে পারবে না। স্কুলে অন্য এক ছেলে খুব ভালো পরীক্ষা দিচ্ছে। পল্টুর বেশ মন খারাপ, কিন্তু যদুবাবু আড়ালে বড় নাতির কাছে জানলেন যে সব বাজে খবর, একটু মজা করার জন্য বলেছে। আদত কথা হোল বাড়ীর অন্য ছেলেমেয়েরা লেখাপড়ায় তেমন ভাল নয়। তাই পল্টুর বারে বারে ফার্স্ট হওয়া ওরা মেনে নিতে পারে না, তাই একটু পিছনে লাগে।

প্রতি বাড়ীতেই দেখবেন একটু বড়ো ছেলে বা মেয়ে ছোট ভাই-বোনদের প্রায় সব সময় পিছনে লাগছে। জামা-কাপড় পরা, খাবার খাওয়া, কথা বলা, পুতুল খেলা, টিভি দেখা এসব নিয়ে কতো অশান্তি। একটা বয়েস পর্যন্ত এসব মেনে নেওয়া যায়, লোকে বলে অমন খুনসুটি বা খুটকি সব বাড়ীতেই আছে। কিন্তু বেশী বয়সের ভালো মেয়েদেরও এরকম করার অভ্যেস চলে যায় না, মেয়েদের প্রায়ই বলতে শুনি "তুই সব বিষয় ওর পিছনে

লাগিস"। বড় দাদা-দিদিদের এই পিছনে লাগার জন্যে কতো শিশুর মে মনের পূর্ণবিকাশ হয়নি তার হিসাব নেই। যতীনবাবুর ছোট ছেলেটি একটু খেতে ভালোবাসে, তুলনায় একটু বোকা, লেখাপড়ায় ভালো নয়, শুনে ওদের বাড়ীশুদ্ধ সব ছেলে-মেয়ে কারণে-অকারণে ছেলেটির পিছনে লাগে, আর হ্যা হ্যা করে হাসে।

শুধু কি বাড়ী, স্কুল-কলেজ, হাটে-বাজারে, অফিস-কাছারিতে, ট্রেনে-বাসে সর্বত্রই এই পিছনে লাগার ব্যাপার। একটু বোকা-সোকা মেয়েটি ক্লাসে যেই পড়া বলতে উঠলো, কিছু বলার আগেই দিদিমণি থেকে আরম্ভ করে ভালো-মন্দ সব মেয়ের মুখে কি হাসি! মেয়েটি থতমত খেয়ে ভুলের পর ভুল বলে দিদিমণির মুখনাড়া ঘেয়ে বসে পড়লো। একটি বেশ ভালো মেয়েকে জানি, প্রেসিডেন্সী কলেজে ফিজিক্স অনার্সে ভর্তি হয়েছিল। মেয়েটি দেখতে ছিল ছোটখাটো। কলেজে প্রথমদিন সকলে উষ্ণ সম্বর্ধনা জানিয়ে বলেছিল—"কি খুকু দুধ খাবে?" ব্যস মেয়েটি দারুণ লজ্জায় বাড়ী ফিরে এসে জ্বরে পড়ে গেল, একটি মাস ভুগেছিল। একজন বয়স্ক লোক হাটে বাজারে যায়, প্রায়ই দেখি ছেলে-বুড়ো তাকে দেখে নানা টিটকিরি করে আর হ্যা হ্যা করে হাসে। বুঝিয়ে-সুঝিয়েও কিছু সুরাহা করা যায়নি। সেদিন মগরাহাট থেকে ট্রেনে চেপে কোলকাতা যাচ্ছিলাম, অর্ধেক রাস্তা বসে গেলে দাঁড়িয়ে থাকা সহযাত্রীকে সিট ছেড়ে দেবার যে অলিখিত নিয়ম চালু হয়েছে জানতাম না। কানে এল দুই একজন ছোকরা আমাকে দেখিয়ে মন্তব্য করছে—"এ নদের চাঁদ কোথা থেকে এলো গুরু, মনে হচ্ছে বাপের গাড়ী চেপে যাচ্ছে।" পাশে চেয়ে দেখি একজন বয়স্ক প্যাসেঞ্জার চোখ বুজে বসেই আছেন। মনে হয় নিত্যযাত্রী, তাকে এক ছোকরা গায়ে হাত দিয়ে নেড়ে বলে উঠলো—"কি দাদু ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে দিদিমার স্বপ্ন দেখছেন, গাড়ী যে সোনারপুর ঢুকছে। ভদ্রলোক মুখের পড়ন্ত লালা টেনে নিয়ে নিয়ে ধড়মড় করে উঠে জায়গা দিলেন। জায়গা

ছেড়ে দিলে ভালো, নয়তো এমন পিছনে লাগবে যে ঐ ট্রেন আপনাকে বরাবর ছাড়তে হবে।

অফিস-কাছারিতে স্রেফ পিছনে লেগে কতো লোকের যে সর্বনাশ করা হয়েছে, গ্রামে বা পাড়ায় পিছনে লেগে কতজনকে যে বাড়ী ছাড়া করা হয়েছে। মাতব্বর বা মস্তানদের কু-নজরে পড়ে কত নিরীহ মানুষকে যে ভিটে বা জমি ছাড়তে হয়েছে সেসবের কোনো হিসেব নেই। 'পিছনে লাগা' নামক জন্মগত মানসিক ব্যাধিটিই ব্যক্তিবিশেষ এবং পরিবেশের বিভিন্নতায় লালিত হয়ে নানা সমস্যার সৃষ্টি করছে বলে আমার বিশ্বাস। কোন্ বয়সে এর প্রকাশ ঘটবে তার স্থিরতা নেই, যেকোনো বয়সে ব্যক্তি বিশেষে এর প্রকাশ হয়। একজন মানুষ সারাজীবন এই রোগে ভুগছে এরকম দৃষ্টান্ত অবশ্য খুবই কম। আমার মনে হয় র‍্যাগিং, ইভ্-টিজিং ইত্যাদি জটিল সামাজিক সমস্যা এই মানসিক ব্যাধি থেকেই জন্ম নিচ্ছে।

"পিছনে লাগা" অন্য এক অর্থে কোনো রোগ নয়, বরং ভালো ফল দেয়। ছেলে পাশ করেছে, এটা নাকি ছেলের কৃতিত্ব নয়। ওর মায়ের দাবী রাতদিন এর পিছনে লেগে থেকে তিনিই এই সাফল্য এনেছেন। সতুবাবুর ছেলে মেডিক্যালে চান্স পেয়েছে। আমার গিন্নী বললেন—হবে না কেন, ওর বাবার পয়সা আছে, চারজন ভালো মাষ্টার ওর পিছনে লেগেছিল। কদিন রাতে কসবায় বোমবাজি হচ্ছে না, পাড়ার এক মাতব্বর বললেন—পিছনে পুলিশ লেগেছে বলে ভণ্টার দল পাড়া ছাড়া। মোহনবাগানকে ইস্টবেঙ্গল হারিয়ে দিয়েছে, আমার ভাইপোকে জিজ্ঞাসা করলাম—তুই বলেছিলিস, কৃশানু দে এমন পাশ দেবে যে শিশির ঘোষ গোল করে ইস্টবেঙ্গলকে হারাবে, তা ব্যাপারটা কি হোল। ভাইপো বললো যে ইস্টবেঙ্গলের কোচ নয়িম তুষার রক্ষিতকে কৃশানুর পিছনে লাগিয়েছিল, কৃশানু তাই বল নিয়ে নড়াচড়া করতে পারেনি।

আমার এই ছাপার অযোগ্য লেখা পড়ে কৃষ্ণস্বামী এ্যান্ড কোং যদি আমার পিছনে লাগেন, তাহলে সবিনয়ে জানাই যে এই লেখাই আমার শেষ লেখা।□

ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী

অর্চিতা রায় চৌধুরী

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের সবচেয়ে কাছের জন একান্ত স্নেহের পাত্রী ছিলেন যিনি তাঁর নাম ইন্দিরা চৌধুরাণী, ডাক নাম বিবি। তাঁর দান অসামান্য।

সম্পর্কে ইন্দিরা কবিগুরুর ভাইঝি—মেজদা সত্যেন্দ্রনাথের মেয়ে। তাঁর পরিচয় প্রসঙ্গে অলকা দেবী লিখেছেন—"ইন্দিরা দেবী ঠাকুর পরিবারের কন্যা, কবিগুরুর স্নেহধন্যা ভ্রাতুষ্পুত্রী, সুখ্যাত সাহিত্যিক বীরবলের সহধর্মিনী।

এই মহীয়সী কন্যার জন্ম হয়েছিল ১৮৭৩ সনের ২৯-এ ডিসম্বর বম্বে প্রদেশের বিজাপুর জেলার কাকদীন শহরে। তখন সেখানে তাঁর বাবা সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর জেলা-জজের কর্মে নিযুক্ত ছিলেন। তাঁর মা জ্ঞানদানন্দিনী দেবী সেকালে বাঙালী মেয়েদের জীবনে যুগান্তর এনেছিলেন। তাঁর দাদার নাম সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর। তিনি রবীন্দ্রনাথের একান্ত আপন ও অনুচরদের অন্যতম ছিলেন।

ইন্দিরাদেবী শৈশবে ইংলণ্ডে ছিলেন প্রায় বছর দু'য়েক। সে সময় তাঁর ছোটকাকা রবীন্দ্রনাথের বয়স আঠারো বছর। বিলেত যাত্রায় তিনিও তাঁদের সঙ্গী হয়েছিলেন। তখন থেকেই ভাইপো-ভাইঝির সঙ্গে কবিগুরুর এক নিবিড় স্নেহের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। কবির মৃত্যু-কাল পর্যন্ত তা অটুট ছিল। খুদে ভাইপো আর ভাইঝির সাহচর্য কবিগুরুর জীবনে অত্যন্ত সুখের হয়েছিল। পরবর্তীকালে কবি রবীন্দ্রনাথ নানান চিঠিতে তা ব্যক্ত করেছেন প্রায়ই। এঁদের কাছে লেখা অজস্র চিঠি কবিগুরুর রসসিক্ত, স্নেহশীল মনের পরিচয় তুলে ধরে। সে সব চিঠি বাংলা সাহিত্যের আজ এক অমূল্য সম্পদ।

বিলেত থেকে ফিরে আসার পর কলকাতায় ইন্দিরা দেবীর শিক্ষা শুরু হয়। ক্রমে স্কুলের পড়া শেষ করে কলেজে ভর্তি হন

এবং ১৮৯২ সনে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক হন। এর বেশ কিছুকাল পর ১৮৯৯ সনে সাহিত্যের আর এক দিক্‌পাল ও ব্যারিস্টার প্রমথ চৌধুরীর সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়। বাংলা সাহিত্যে প্রমথ চৌধুরী "বীরবল" নামেই পরিচিত তাঁর রস-সাহিত্যের জন্য। তাঁদের মিলিত জীবন অত্যন্ত সুখের হয়েছিল। তাঁরা ছিলেন একে অন্যের পরিপূরক। বিয়ের পর ইন্দিরা ঠাকুর হলেন ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী। সে নামেই তিনি বেশি পরিচিতা সকলের কাছে।

১৯১৪ সনে প্রমথ চৌধুরীর সম্পাদনায় বের হয় "সবুজপত্র"। ইন্দিরা দেবীর প্রবন্ধ "নারীর উক্তি" এই সবুজপত্রেই প্রকাশিত হয়। ইন্দিরা দেবী শুধু লেখাতেই নয় প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সঙ্গীতেও বিশেষ পারদর্শিনী ছিলেন। ১৯৩৮ সনে তাঁর বড় জা প্রতিভা দেবী প্রতিষ্ঠিত "আনন্দসভা" সঙ্গীতভবনে পরে ইন্দিরা দেবীও অত্যন্ত উৎসাহ নিয়ে যোগ দেন। এই সঙ্গীতভবনে কাজের সময়েই তিনি স্বামী প্রমথ চৌধুরীর সাহায্যে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের অনেক গানের স্বরলিপি প্রকাশ করেন। এই সঙ্গীতভবনটির পরে নাম পরিবর্তন হয়ে নাম হয় "সঙ্গীতসঙ্ঘ"। প্রতিভা দেবীর মৃত্যু পর্যন্ত ইন্দিরা দেবী সঙ্গীতসঙ্ঘের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।

প্রতিভা দেবীর মৃত্যুর পর তিনি প্রমদা দেবী প্রতিষ্ঠিত সঙ্গীত সম্মিলনীতে যোগ দেন। এই সঙ্গীত সম্মিলনীতেই রবীন্দ্র সঙ্গীতের সঙ্গে দ্বিজেন্দ্রলাল রায় রচিত সঙ্গীত এবং অন্যান্য সঙ্গীত চর্চা শুরু হয়। তারপর তিনি কলকাতাতেই "গীতবিতান" সঙ্গীত শিক্ষার বিদ্যালয়ের সভানেত্রীর কার্যভার গ্রহণ করেন।

১৯৪২ সনে তিনি কলকাতার কর্মধারা থেকে অবসর নিয়ে কবিগুরু প্রতিষ্ঠিত শান্তিনিকেতনে চলে আসেন। শান্তিনিকেতন যখন বিশ্বভারতী হল তখন তারই নানা কাজে তিনি নিজেকে নিয়োজিত করেন। "সঙ্গীতভবন" তাঁকে পেয়ে কৃতার্থ হয়। এই

সময় তিনি রবীন্দ্রনাথের হারিয়ে যাওয়া অনেক পুরনো গানের সুর খুঁজে বের করেন এবং শান্তিনিকেতনে তা শেখান। রবীন্দ্র সঙ্গীতের মূল উৎস, তার বিকাশ ইত্যাদি বিষয়ে ইন্দিরা দেবী অনেক প্রবন্ধ লেখেন এবং বক্তৃতাও দেন।

অবসর সময়ে তিনি "আলাপিনী" নামে মহিলা-সমিতির কাজে মেতে ওঠেন। "বাংলার মহী আচার" বিষয়ে প্রকাশ করেন এক সংকলন। আর পরিচালনা করেন "ঘরোয়া" পত্রিকার। রবীন্দ্র বিষয়ে লেখেন—১। রবীন্দ্র স্মৃতি ও ২। রবীন্দ্রসঙ্গীতের ত্রিবেণী সঙ্গম।

তাঁর সে সময়ের অজস্র অদম্য কর্মধারার উৎস ছিলেন রবি-কাকা। কর্মের আনন্দে তিনি যেন তারুণ্য ফিরে পান। বিশ্ব-ভারতী তাঁকে প্রথম মহিলা উপাচার্য রূপে বরন্যকরে ধন্য হয় ১৯৫৬ সনে। তার ঠিক এক বছর পরই তাঁকে দেওয়া হয় বিশ্ব-ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মানিত "দেশিকোত্তম" উপাধি (১৯৫৭ সনে)।

যখন তিনি বিশ্বভারতীর নানান কাজে ব্যস্ত তখন তাঁকে অটোগ্রাফের জন্য অনুরোধ জানিয়ে চিঠি লিখেছিলাম। উত্তর পাব আশা করিনি। আমাকে অবাক করে ডাকঘরের রাজার চিঠির মতই একদিন তাঁর ছোট কবিতায় লেখা চিঠি এল আমার নামে। আমরা তখন দেওঘরে। কবিতাটি এখানে তুলে দিচ্ছি—

অর্চিতা, যদিও তুমি অপরিচিতা,
চেয়েছ যে সহি মম, দিনু লিখি তা,
তোমারেও আমি শুধু নামে মাত্র জানি
মোর নাম ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী—।

তিনি ছিলেন রবীন্দ্রধারার শেষ প্রতিনিধি, শেষ উত্তরাধিকারী। ১৯৬০ সনের ১২ই আগস্ট তাঁর আত্মিক জীবনের পরিসমাপ্তি হয়, কিন্তু আজও রয়ে গেছেন আমাদের মধ্যে নানান সঙ্গীতে এবং ভাবনায়। তার যে শেষ নেই, শেষ কথা কে বলবে আজ? □

নীলগিরি মালাবার পাহাড় জঙ্গল জয়ন্তী সান্যাল

১৮৬০ সালে পুনা থেকে পাহাড় অঞ্চলের জরীপ করতে গিয়ে কেরালা পশ্চিমঘাট পাহাড়ের কোলে কান্নানদেরড় পাহাড়ী অঞ্চল আবিষ্কৃত হয়। ওয়েলস্‌লি ও ওয়েলিংটন সাহেব টিপু সুলতানকে আটকাতে গিয়ে ওখানে এসে এই অপূর্ব তরঙ্গায়িত ও দিগন্ত বিস্তৃত পাহাড়ের শ্রেণী আবিষ্কার করেছিলেন—সেখানে পাহাড় ঘেরা একটি চমৎকার হ্রদ। কথিত, পৌরাণিক যুগে সীতাদেবী এখানে চান করেছিলেন। ত্রিবাঙ্কুরের রাজারা এই পাহাড় পরিবৃত জঙ্গলে দারুচিনি, মশলা ও চায়ের চাষ শুরু করেন। মহারাজার একটি সুন্দর রাজবাড়ী ১৮৭৮ সালে হস্তান্তরিত হয়। দেবীকুলম হ্রদের পাশে কফি, সিঙ্কোনা, শাল, দারুচিনি ও চা-পাতার চাষ হয়। ১৯০৮ সালে ১৬০০০ একর জমিতে James Finley Tea Co স্থাপিত হয়েছে। রাস্তা, বাংলো, রোপওয়ে, ডাকঘর, ডাক্তারের সুবিধা আরম্ভ হয়েছে।

মুন্না শহরটি তিনটি ছোট নদী নন্দা, কেনা প্রভৃতি দিয়ে পরিবৃত—এটি রাজ্যপালের গ্রীষ্মকালীন আবাস পাহাড়ের সবুজ কন্দরে। এখানে প্রকৃতির রূপ মানুষকে পাগল করে দিতে পারে। বহু বন্য জন্তু ও বহু জাতের গাছ-গাছালি, ফল-ফুলে জায়গাটিকে ঘিরে রেখেছে। এই জঙ্গলে হাজারের মত বুনো মালাবারী বন্য ছাগল চকিতে দেখা দিতে পারে। মালাবারী লালরঙের রডোডেনড্রন ফুলে বসন্তে আকাশ-বাতাস মাতিয়ে তোলে আগুনের রঙে। চরাচর ঝলমল করে ভোরের আলোকে জুনিপার ও বুনোঘাসের জঙ্গল। চড়াই-উৎরাই করতে করতে এখানকার ট্রেকিং করার ছেলেদের পিঠের বোঝায় শুয়ে পড়বার মত অবস্থা হয়। ভোরবেলার ঠাণ্ডা বাতাসে মেঘের দল ওদের ছুঁয়ে যাবে আলতো স্পর্শে। মেঘ-বৃষ্টি-ঝড় ঝাঁপিয়ে এসে এদের বিপর্যস্ত

পর্যুদস্ত করে—তবে-না পাহাড়ে-চড়া আর পাহাড়ে আসা সার্থক হবে।

কয়েম্বাটুরে আছে, পীর মহম্মদের সমাধি। হিন্দু-মুসলমান গাজীর পীরে শ্রদ্ধাভরে মোমবাতি দেয়। রাতের অন্ধকারে ঝিকমিক জোনাকীর রূপ মাথার উপরে, রাত-চরা পাখীর ডাক, চাঁদের মোহময় স্তব্ধতা। ঘন জঙ্গলে একটা চমৎকার পরিবেশ এনে দেয়।

এর্নাকুলমের কাছে নীলগিরি সংরক্ষণ জাতীয় পার্ক—এখানে টাটা Tea-এর চাষ বিখ্যাত। ব্লু-রঙের পাহাড়ীফুল বারো বছরে একবার ফুটে বন মাতিয়ে দেয়। আর আছে বিভিন্ন প্রজাতি ফুল-পাখী ও বন্যপ্রাণী। ফুল ব্ল্যাক-wood, রোজবুশ, ক্রটলিয়া, কমলিনা পাখী—ফ্লাইক্যাচার, মার্টিন, শঙ্খচিল, শিস্‌ দেওয়া স্কাইলার্ক, ঈগল, নানারঙের প্রজাপতি ও মথ পাতার আড়ালে লুকায়।

মালাবার ল্যাঙ্গুর, বিরাট বড় কাঠবেড়ালি, বন্য কুকুর, বার্কিং হরিণ সংখ্যায় এখন বাড়ছে। এই কুমারী অরণ্যে অসংখ্য ঝর্না, পাহাড়ী ঝোরা সারা বছর জলে ভর্ত্তি থাকে, ঝর্না যেন সাদা মসলিনের ওড়না কালোপাথরে বিছানো। মধুবনে আছে ছয়শত বছরের পুরানো আদিবাসী জনজাতি। এরা নির্লোভি, স্বাস্থ্যবান। সাদা পোষাকে নানারকম ধামসা, ঢোলকের সঙ্গে অপূর্ব নেচে চলে মনের আনন্দে। যাযাবর বৃত্তি ছেড়ে এরা চাষবাসে মন দিয়েছে। বনের উৎপন্ন দ্রব্য খুব কম পেয়েও, এরা সন্তুষ্ট থাকে।

এখানে মেলা হয় শিবমন্দিরে। চারিদিকের লোক বেসাতি মজা করতে মেলায় জড় হয়।

পথে ষ্ট্রবেরি, আঙ্গুর কলা, ন্যাসপাতি কোথাও কোথাও পাওয়া যায়। পাহাড় ও সমতলভূমি কানাকানি করে। ধাই কুড়কুড় করে পাহাড়ে বেড়িয়ে আসার জন্য বেরিয়ে পড়ি, চলুন। □

পুস্তক পরিচয়

☐ "হারিয়ে যাওয়া দিনের গল্প"—সন্তোষকুমার ভট্টাচার্য্য। বই পড়ে অবসর সময় কাটানোর পক্ষে বইটি সুখপাঠ্য। নানান ঘটনা বিন্যাসে বিন্যস্ত। মাঝে মাঝে লেখার যোগসূত্র একটু হারিয়ে গেলেও লেখা মনকে ধরে রাখে। ছোট গল্পগুলিতে নতুনত্ব আছে।

☐ "একা এবং অন্ধকার"—সুশান্ত সরকার। বইটি কবিতা সংকলন। কবিতাগুলি দুই, চার অথবা ছয় লাইনে। সব কবিতার মর্ম স্পষ্ট হয়নি।

☐ সময়ের এক্সরে প্লেট—নিশিনাথ সেন। বইটি কবিতা সংকলন। কোন কোন কবিতার ভাব উচ্চমানের। "এখন বিকেল" "জুলি" "উপসাগরীয় যুদ্ধ ও তারপর" "ফাঁসি" কবিতাগুলি সুলিখিত।

☐ "কালের যাত্রার রথ" "জনপথ"—ডঃ সতীশচন্দ্র মাইকাপ। দুটি বই-ই প্রবন্ধ সংকলন। জনপথ ভারতের নানান বিখ্যাত শহরের প্রাকৃতিক ও ঐতিহাসিক বর্ণনা। হিমালয় বর্ণনার রচনা-শৈলী মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের রচনাকে স্মরণ করায়। তীর্থস্থান গুলির মাহাত্ম্য বর্ণনা সুন্দর। মালাবারের ঘটনা পরম্পরা মনকে উদাস করে। সমুদ্রের বিস্ময় বিমুগ্ধ রূপ বর্ণনা শৈলীর চমৎকারিত্ব উল্লেখযোগ্য। "কালের যাত্রার রথ" বইটির কয়েকটি প্রবন্ধ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রেক্ষাপটে লিখিত এবং সুভাষচন্দ্র সম্বন্ধে প্রবন্ধগুলি সবই তথ্যমূলক। এই সকল লেখার মধ্যে দিয়ে লেখকের আদর্শবাদী মন ও স্বদেশপ্রেম ফুটে উঠেছে। "দিল্লী" ও "রাজদরবার"-এর প্রবন্ধগুলির পরিবেশন সুন্দর ও মনোগ্রাহী। লেখকের জীবনে যে গোলাপটি অকালে ঝরে গেছে তার জন্য আমরাও সমব্যথী।

☐ "বৈরী সময় বিরূপ সময়"—কবি মঈনুল ইলামস চৌধুরী। সৈনিক প্রকাশনী, সিলেট, ৩০ টাকা। বইটির কবিতা-গুলি সুলিখিত। নানান ভাবনায় ভরা কবিতাগুলি পড়তে ভাল লাগে। কবি আশাবাদী, হতাশাকে ছাড়িয়ে তার মন "বিষাদ থেকে প্রসন্নতায় ঝাঁঝরা এ মন পৌঁছতে চায়"। এই প্রসন্নতাই মানুষকে বাঁচিয়ে রাখার প্রেরণা যোগায়।

☐ "মহাদাতা মহাপ্রভু"—শ্রীহরিহরানন্দ। সর্বোদয় বুক স্টল, হওড়া স্টেশন, আশি টাকা। বৈষ্ণব দর্শন-এর ওপর লিখিত পুস্তকটি তত্ত্বমূলক। ভাগবত ও চৈতন্যচরিতামৃত থেকে অজস্র উদ্ধৃতি লেখকের পাণ্ডিত্য ও মননশীলতার পরিচয় দেয়। গীতার ব্যাখ্যা সুবোধ্য। ভারতীয় দর্শনের বিভিন্ন মতবাদের প্রাঞ্জল ব্যাখ্যা সাধারণের ভাল লাগবে। কৃষ্ণতত্ত্ব ও ভক্তিতত্ত্ব ব্যাখ্যায় লেখকের আধ্যাত্মিক ভাবনার স্বরূপতা প্রকাশ পেয়েছে।

ধীরা ভট্টাচার্য

☐ দেশদেশান্তরে—অর্চিতা রায় চৌধুরী। মূল্য তিরিশ টাকা। (আরও বেশীও হতে পারত) কিন্তু ১৯৭৪ থেকে ১৯৯৪ এই বিশ বছরের ঘটনাগুলি একটি অসাধারণ রচনার সম্ভাবনা নিয়েও কেন তা হতে পারল না, শত ত্রুটিতে ক্ষতবিক্ষত হয়ে গেল? এই অনুসন্ধানই পুস্তকের পাঠক সংখ্যা বৃদ্ধি করতে পারলেও, সেখানে সততা, সৌন্দর্য সব অতলে তলিয়ে গেল বলে দুঃখ হয়।

লেখিকা মনোবিজ্ঞান নিয়ে ডকটরেট করতে গিয়েছিলেন লণ্ডন, পারিবারিক কারণে কাজ অসম্পূর্ণ রেখেই কলকাতায় ফিরতে বাধ্য হয়েছিলেন। আমার যৌবন কালের বন্ধু—ডঃ তারাপদ বোস এবং যুগান্তরের সাংবাদিক বিশ্বনাথ মুখার্জী শ্রীমতী রায় চৌধুরীর সঙ্গে লণ্ডনে ছিলেন অনেক দিন। শুনেছি শ্রীমতীর স্বভাব অতি মিষ্ট, আচরণ মধুর, বিনয়ী, প্রয়োজনে

কঠোর প্রতিবাদী এবং সাংস্কৃতিক পরিচয় অগাধ। তাঁর দেখা হয়েছে ভারতবর্ষকে, এশিয়া, আমেরিকা, জাপানকে ইউরোপের কিছু কিছু অঞ্চলকে। এখনও উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকা, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, আফ্রিকা, ব্রহ্মদেশ, শ্রীলংকা, পাকিস্তান, বাংলাদেশ, নেপাল, ভুটান দেখেননি। আয়ু থাকলে দেখবেন। দেখেছেন হিটলারের গড়া 'অটোবান' এবং জার্মানীর ফেলা বোমা বেলজিয়ামের 'লিটিল বয়' কেমন করে অকেজো করে দিয়েছিল তার প্রস্তরমূর্তি। কিন্তু প্রকাশনার গুণে বইটির রূপ একেবারেই পাল্টে গেছে বলে দুঃখ হয়।

সাগর পারের প্রথম বাঙালী মহিলা লেখিকা অর্চিতা নয়, অক্ষয় নন্দীর কন্যা উদয়শঙ্করের স্ত্রী অমলা, লিখেছেন 'সাত সাগরের পারে'। গিরীন্দ্রশেখর বসুর কন্যা শ্রীমতী দুর্গা ঘোষ লিখেছেন—"ফ্রয়েডের সঙ্গে আলোচনা" ইত্যাদি অনেকে আগে।

প্রকাশকদের বোধ হয় ধারণা—মেগাস্থনীশ, ইয়েনসাঙ ও ফন হিয়েন নামগুলির সঙ্গে জলধর সেন, উমাপ্রসাদ, প্রবোধ সান্যাল, সুবোধ চক্রবর্তী, শঙ্কু মহারাজ আর অবধূত জুড়ে দিলেই সব বলা হয়ে গেল। এঁরা শরচ্চন্দ্র দাশের তিব্বতী সংগ্রহের নামটি করেননি।

তাই মনে হয় সমস্ত রচনাটির ওপর হাল্কা বেলাজ পনার প্রলেপ মাখাতে পারলেই বাজার সাফল্য অর্জন করা যায় ভেবেছেন। তবু আশা করব বইটির যাত্রা শুভ হোক! অর্চিতা রায়চৌধুরী আরও লিখুন। □

বিশ্বনাথ ঘোষ

মতামত

'অনুরাগ' তৃতীয় সংকলনে শ্রীবিশ্বনাথ ঘোষের লেখা 'ঠাকুর-বাড়ির ইতিকথা' পড়লাম। বাঙালীর শিল্প সংস্কৃতির সাধনায় ঠাকুর বাড়ীর স্থান একেবারে প্রথমে, একথা মেনে নিতে বোধ হয় কারো আপত্তি হবে না। তাই ঠাকুরবাড়ীর ইতিকথা জানবার আগ্রহ এবং কৌতূহল বহু মনে স্বাভাবিকভাবেই জাগ্রত। অনেক পড়ার অবকাশ বা সুযোগ যাদের নেই, তাদের পক্ষে শ্রীঘোষের এই ছোট প্রবন্ধটি খুবই উপযোগী।

প্রবন্ধটির প্রথমেই রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে কৃষ্ণ কৃপালনীর যে তীব্র মন্তব্যটি লেখক উল্লেখ করেছেন, তার উদ্দেশ্য হয়তো এই যে চিঠিগুলো আগুনে না পোড়ালে দ্বারকানাথ সম্বন্ধে আমরা কিছু তথ্য পেতাম। একথা সত্য। কিন্তু সেই সঙ্গে সোনার মফ্‌চেনটির কথা শ্রীঘোষ উল্লেখ না করলেই পারতেন। কারণ সোনাকে তো আর চিঠির মতো পুড়িয়ে ছাই করে ফেলা যায় না। সোনাই থাকে। সেই সোনা রবীন্দ্রনাথ যদি কোন বড় কাজে লাগিয়ে থাকেন, তাহলে ভাগ করে না নিলেই ভুল করতেন। এ নিয়ে গবেষণার প্রয়োজন আছে, তথ্যের প্রয়োজন আছে। কৃষ্ণ কৃপালনীর তীব্র মন্তব্যের মধ্যে একটা রুদ্ধ ক্ষোভের ব্যঞ্জনা আছে, শ্রীঘোষ যা উপেক্ষা করলেই ভালো করতেন বলে আমার মনে হয়।

শ্রীঘোষ এই প্রবন্ধে দ্বারকানাথ ঠাকুরের পাঁচ পুরুষের কথা জানাতে চেয়েছেন। প্রথম পুরুষ দ্বারকানাথ সম্বন্ধে যা বলেছেন, তাতে মানুষটির সম্পর্কে একটি সুস্পষ্ট ধারণা করতে অসুবিধা হয় না। দ্বিতীয় পুরুষ দেবেন্দ্রনাথ সম্বন্ধেও অল্প কথায় তাঁর ব্যক্তিত্ব এবং অবদানের পরিচয় দিয়েছেন

তৃতীয় পুরুষ রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে তাঁর নোবেল প্রাইজ পাবার ব্যাপারটা উল্লেখ করাই যথেষ্ট মনে করেছেন। ঠিকই করেছেন

মনে হয়, কারণ রবীন্দ্রনাথের যে ভাবমূর্তি বাঙালীচিত্তে মুদ্রিত, নোবেল প্রাইজ পাবার সঙ্গে তা নিবিড়ভাবে সম্পর্কিত। তাছাড়া রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে এত কথা বলার আছে এবং এত কথা বলা হয়েছে যে এই ছোট প্রবন্ধে সে রকম কোন প্রয়াসের অবকাশ নেই।

বরং চতুর্থ পুরুষ সম্পর্কে শ্রীঘোষ আরো কিছু তথ্য দিলে ভালো করতেন, কারণ সুধীন্দ্রনাথ, বলেন্দ্রনাথ বা সুরেন্দ্রনাথ সাধারণ্যে তেমন পরিচিত নন।

পঞ্চম পুরুষ সৌম্যেন্দ্রনাথ সম্বন্ধে লেখক বেশ কিছু তথ্য দিয়েছেন। প্রবন্ধটি পড়া শেষ হলে মনে হয়েছে লেখকের চিন্তায় পঞ্চম পুরুষই প্রাধান্য পেয়েছে। প্রবন্ধের অনেকখানি জায়গা জুড়ে আছেন এই পঞ্চম পুরুষ। ওতে আপত্তির কারণ দেখিনে, কারণ সৌম্যেন্দ্রনাথ যে ঠাকুর বাড়ীর ইতিকথায় একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছেন, সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নেই। □

—সুধীরকুমার গঙ্গোপাধ্যায়

সেলিমপুর রোড, কলকাতা-৩১

শশী-সূর্যের মিলন-মাধুরী

সুধা চট্টোপাধ্যায়

অতি অপরূপ নীল অম্বরে
মিলন বাসর রচিল প্রকৃতি,
শশী সূর্যের বিরহী হিয়া
প্রেম-পুলকে করিল গ্রহণ।
বিশ্ব-বীণা তুলি ঝংকার
মোহিনী মায়া ছড়াল ভুবনে,
গ্রহ তারকা ঘিরিয়া ঘিরিয়া
নৃত্যে নূপুর বাজায় সঘনে।
সাগর-সিন্ধু উথলি অম্বু
ঊর্মিমালায় দেয় অঞ্জলি,
কুসুম সুবাসে ভরে সমীরণ
দোলায়ে পর্ণ দেয় করতালি।
বিহগ-বিহগী বন্দনা-গীতে
তোলে সুরলহরী গগনে পবনে,
পরম শ্রদ্ধায় প্রণতি জানায়
মহা দ্যুতির রাতুল চরণে।
দিবাকর সুধাকর হীরক-উজ্জ্বল স্নিগ্ধ আলোকে
দয়িত-দয়িতা একদেহে লীন,
দীর্ঘ প্রতিক্ষার যাতনা বেদনা
শেষ লগনে ক্লান্তিবিহীন।
মর্ত্যবাসী হেরিয়া নয়নে
পুলক-বিস্ময়ে বাক্য হারায়,
লক্ষ কণ্ঠে উঠিল ফুকারি
ধন্য জনম বসুন্ধরায়॥ □

বেশ তো ছিলিস নমিতা ভট্টাচার্য

মাটিরই বুকে ভূমিষ্ঠ হয়ে মানুষ
ভয়ে কান্নায় 'ট্যাঁ' 'ট্যাঁ' শব্দ করলে
মা বলে, ভয় কী আমার বুকে অমৃত
চাষ কর মাটি জলাশয়, পশুপালন
তোর অভাব কী!
পরিশ্রম কর প্রাণপণ—সুখ শান্তি।
একদল মানুষ বললে, দূর
মা বড় পুরনো, বোঝে কম
ওই যে পাহাড় ওর ওপারে সূর্য—
বিজ্ঞান আরাম আয়াস স্বাচ্ছন্দ
আমরা পাহাড় ডিঙবই।
মাটি ছেড়ে ওপারে ওঠার নেশায় মাতল
দিন মাস বছর শতাব্দীর পর শতাব্দী গেল
মানুষ যখন পাহাড়ের শীর্ষে
সূর্য কই! সূর্য চাই।
সুরু হল কাড়াকাড়ি মারামারি
হত্যার রাজনীতিতে ভাই বন্ধু প্রতিবেশী।
পুব আকাশে সূর্য টুক্ করে মাথা তুলে **সব্যঙ্গে বলল,**
দূর বোকা, আমাকে পাওয়া কী এতই **সহজ!**
কেন পুড়ে মরবি
বেশ তো ছিলিস। □

অনুরাগে মঈনুল ইসলাম চৌধুরী

বাঙলা ভাষার অনুরাগে আমি
প্রতিদিন লিখে যাই,
এ-ভাষায় আমি অপার সুখের
ঠিকানাটি খুঁজে পাই।

নদীর মতন এ-ভাষা আমার
ধমনীতে বহমান,
এই ভাষাতেই গেয়ে যাই আমি
জীবনের জয়গান।

এই ভাষাতেই কবিতা আমার
বাঙময় হয়ে ওঠে,
এ-ভাষা আমার মনের বাগানে
গোলাপের মতো ফোটে। □

শ্রেয়সী দেবকুমার গুহ

স্বপনে যে ছিল প্রেমের আসনে
মোর প্রিয় ওগো প্রেয়সী
আমারে জড়াও পাপের জগতে
পরম পুণ্য শ্রেয়সী।
শ্রেয়ের জগতে অনেক পুণ্য
অনেক শূন্য আমি
কে এনে দেয় সেই সে পরশ সর্ব দিবস যামী।
প্রেয়সী আমার আমার প্রেয়সী কত না কথাই মনে
এসেছি যে ভুলে সোহাগে যে দুলে
কিছু কথা যাই বলে।
ওগো মোর তুমি শ্রেয়সী পরম পুণ্য প্রেয়সী॥ □

পারো কি হরি ভট্ট

আনবিক শক্তি দিয়া—
ধ্বংস করে দিতে পারো,
নিষ্প্রাণ করিতে পারো
গোটা এই মহাদেশ।
মৃত এক পিপিলিকায়—
পারো কি দানিয়া প্রাণ,
নির্মল আনন্দ দিয়া—
এনে দিতে মধু পরিবেশ ?
পারো কি জীবন দিতে—
সখ করে ছিঁড়ে নেওয়া গোলাপের ওই গুচ্ছটিতে ?
শুষ্ক মাধবী লতায় পারো কি সবুজ এনে,
সতেজিত সুস্থ প্রাণ দিতে ?
কোটি কোটি লোক কত—
মরিতেছে দুরারোগ্য রোগে,
বাঁচার আকাঙ্ক্ষা নিয়ে,
বুভুক্ষু অন্তর কত—
যন্ত্রণায় শুধু রোগ ভোগে।
যে রোগে ওষুধ নাই, সীমাহীন নিরাশায়—
গণিতেছে মৃত্যুর দিন,—
পারো কি ফিরায়ে দিয়া, তাদের জীবন,—
শুধিতে পারো কি তুমি, অভিশপ্ত পৃথিবীর ঋণ ?
শক্তি দিয়া, অস্ত্র দিয়া—
যাহা পারো ধ্বংস করিবারে,
বিজ্ঞান, প্রযুক্তি দিয়া, পারো নাকি,
দাম্ভিক এ পৃথিবীতে—
অনির্ব্বাণ শান্তি আনিবারে ? □

শাশ্বত প্রেম ধীরা ভট্টাচার্য

প্রেম, ছোট্ট একটি চার অক্ষরের শব্দ
কিন্তু কী ভীষণ এর শক্তি।
সৃষ্টির আদিতে যখন পরমাত্মা ছিলেন এক,
প্রেমাবেশে নিজেকে বিভক্ত করি, ধরি রূপ
অর্ধনারীশ্বর সৃজিলেন প্রথম প্রেমে বিশ্ব চরাচর।
চন্দ্রচূড় জটাজালে ধরিয়া রাখিতে জাহ্নবীরে
ধ্যানমগ্ন প্রেমময় শংকর পাতিলেন মস্তক
আপনার। অপর্ণার প্রেম ভঙ্গ করিল তপস্যা ভৈরবের।
শ্রীরাধার প্রেম—রাধিকারমণের প্রতি
মধুসূদনের প্রেম—শ্রীমতীর প্রতি
দুঁহুঁ প্রেমে দুঁহুঁ ভাসে দুটী তারা প্রেমাকাশে
অপলকে রহে চাহি দুঁহুঁ দুঁহুঁ পানে।
প্রেমাবতার শ্রীচৈতন্য ভাসালেন জগৎ সংসারকে
প্রেমের সাগরে, বক্ষে নিলেন তুলি আপামর
জীবকে আপন করিয়া ভাসিলেন আপনি
প্রেম সাগরে।
কবি বলেন, প্রেমের সমাধি তাজমহল
আমি বলি, প্রেমের বাসর ঘর, যেথা
কুসুমাস্তীর্ণ শয্যায় শায়িত আছেন শাজাহান, মমতাজ।
যে প্রেম মরণকে করেছে ম্লান প্রেমকে করেছে শাশ্বত।
কবে কোন্ যুগ হতে চলিছে এ লীলা খেলা
কে পারে কহিতে ?
বিচ্ছেদ দিয়াছে এ প্রেমকে এক নতুন অভিব্যক্তি।
আজিও বহিছে এ প্রেমধারা সুরধনী সম এ বিশ্ব মাঝারে।□

পদ্মা গঙ্গা ইলিশ কথা শ্রীদীপককুমার গুপ্ত

পদ্মার ইলিশ এলো এদেশে অনেকদিন পরে।
বড় বড় ইল্‌শা দেখে মনটা কেমন করে ভাইরে,
মনটা কেমন করে!
এই ইলিশ এসেছে টেক্কা দিতে গঙ্গার মাছের সাথে
পদ্মার না গঙ্গার ইলিশ পড়বে সবার পাতে রে ভাই.
পড়বে সবার পাতে।
'আমার সোয়াদ অনেক ভালো, পদ্মার মাছ কয় জোরে—
'আমি কমতি কিসের? গঙ্গার মাছ বলতে না ছাড়ে।
বড় বড় ইল্‌শা দেখে মনটা কেমন করে ভাইরে,
মনটা কেমন করে!
'আমারে আনার লইগ্যা তোমাগো নেতার কত চেষ্টা'
তুড়ি মেরে গঙ্গার মাছ বলে, খুঁজেছে ঘুরে দেশটা?
অমার গঠন দেখে জামাই আমাকে পছন্দ করে—
জামাইষষ্ঠীর উপকরণ আমায় না হ'লে কি ভরে?
বড় বড় ইল্‌শা দেখে মনটা কেমন করে ভাইরে,
মনটা কেমন করে!
পদ্মার মাছ বলে, 'আমি তো, ভাই, বেশী উজানে থাকি—
আমার লগে দৌড়াইবে—এমন মাছ আর আছে না কি?
গঙ্গার মাছ বলে, 'উজানে ধরে আমাকে আনে বাজারে।
কর্তার মুখটা ব্যাজার হয়, যদি কোল-গাদা অন্যপাতে পড়ে।'
বড় বড় ইল্‌শা দেখে মনটা কেমন করে ভাইরে,
মনটা কেমন করে!
পদ্মার মাছ মানে না হার। বলে, 'আমি খোশবু ছড়াই'।
গঙ্গার মাছ বলে, 'আমার ঘ্রাণে গিন্নীর কতো বড়াই।'
'আরে, আমার লইগ্যা পাগল হয় বাড়ির রাধুনী, বৌ—
তারা সইরষা-ইলিশ-পাতুরি খায়, খাইতে চায় না মৌ।'
দুই ইলিশের কাজিয়া, ভাই, কেউ কাউকে না ছাড়ে।
বড় বড় ইল্‌শা দেখে মনটা কেমন করে ভাইরে,
মনটা কেমন করে!□